সারসংক্ষেপ (Abstract)

বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রীয় রুচি, রূপ, রীতি ও বিশ্বাসকে অগ্রাহ্য ও বিচূর্ণ ক'রে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে যে পালাবদল শুরু হয়েছিল জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭) ছিলেন তার প্রধান ঋত্বিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কালে মানুষের জীবনে অনিবার্যভাবেই টিঁকে থাকার জন্য এসেছিল প্রবল গতির তাড়না। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালের ফসল ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ আত্মস্বার্থ সর্বস্বতা, শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ইঁদুর দৌড় প্রসূত পারস্পরিক সন্দেহ-হিংসা বিদ্বেষ-শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণার বিষবাষ্প ছেয়ে ফেলেছিল পৃথিবীর স্বচ্ছ-নির্মল-মুক্ত আকাশকে। জীবনের প্রতি পলে পলে প্রত্যাশার আলোক রশ্মি ম্লান থেকে ম্লানতর হয়েছে। এই অন্ধকার সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ব্যক্তি সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে নেমে এসেছে এক 'অদ্ভুত আঁধার'। সেই আঁধারে নিমজ্জমান মানুষের অন্তরের গহন লোকে প্রবেশ করে তাদের জীবনধারাকে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সংবেদনশীল স্রষ্টারা লিপিবদ্ধ করে চলেছেন। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে সেই লিপিবদ্ধকরণের কাজটি উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে শুরু হলেও সেই অর্থে জীবন সমস্যার অতলে পৌঁছতে পারেননি সেই সময়ের অন্যতম স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি মূলতঃ ইতিহাস ও ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সধর্মী উপন্যাস, তত্ত্বকথা নির্ভর উপন্যাস আর অনেকটাই নীতিকথার রং চড়িয়ে তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথই প্রথম মানব জীবন সমস্যার গভীরে ডুব দিয়ে তুলে এনেছেন চরিত্রদের 'আঁতের কথা'কে। কিন্তু ঔপনিষদিক ভাবনায় আলোকিত রবীন্দ্রনাথ মানব মনের অন্ধকার দিকটিতে সেভাবে আলোকপাত করেননি। রবীন্দ্রনাথের পরে শরৎচন্দ্র মাটি ঘেঁষা জীবনের কাছাকাছি মানুষের কথা তুলে এনেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে; কিন্তু সেখানেও ছিল ভাবাবেগের আতিশয্য। সেদিক থেকে শরৎচন্দ্রের 'মানসপুত্র' জগদীশ গুপ্তই প্রথম মানবজীবনের সেই অন্ধকার রাজ্যে নিয়ত বিচরণ করে তুলে এনেছেন আচরণের আড়ালের মানব চরিত্রকে।

১৮৮৬ সালের জুন মাসে তৎকালীন নদীয়া জেলার মহকুমা কুষ্ঠিয়া শহরের গড়াই নদীর তীরবর্তী আমলাপাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে লেখকের জন্ম। তারপর বিচিত্র

জীবন অভিজ্ঞতা লাভ। ব্যবসা থেকে শুরু করে আদালতে টাইপিস্টের চাকরী সূত্রে স্বচক্ষে দেখা গ্রাম থেকে শুরু করে শহরতলীর জীবনধারাকে তিনি অংকন করতে গিয়ে মানুষগুলির দারিদ্র, হতাশা, গ্লানির পাশাপাশি তাদের জৈবিক সম্পর্ক হিংসা-বিদ্বেষসহ জীবনের যাবতীয় ক্লেদ পঙ্কিলতাকে তুলির টানে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে। মৃত্যুর পর প্রকাশিত 'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০) -কে তার শেষ উপন্যাস ধরলে তিন দশকেরও বেশী সময়ে তিনি মাত্র ১৭টি উপন্যাস লিখেছিলেন। কালানুক্রমের নিরীখে তাঁর উপন্যাসগুলি হল—

'অসাধু সিদ্ধার্থ' (১৯২৯)

'মহিষী' (১৯২৯)

'লঘুগুরু' (১৯৩১)

'রোমন্থন' (১৯৩১)

'দুলালের দোলা' (১৯৩১)

'যথাক্রমে' (১৯৩৩)

'তাতল সৈকতে' (১৯৩৩)

'সুতিনী' (১৯৩৩)

'রতি ও বিরতি' (১৯৩৪)

'গতিহারা জাহ্নবী' (১৯৩৫)

'দয়ানন্দ মল্লিক ও মল্লিকা' (১৯৩৯)

'নন্দ আর কৃষ্ণা' (১৯৪৭)

'চৌধুরাণী' (১৯৪৭)

'আলুনী আলু' (১৯৫০)

'নিষেধের পটভূমিকায়' (১৯৫২)

'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ' (প্রকাশকাল জানা যায়নি)

'কলঙ্কিত তীর্থ' (১৯৬০)

একদিকে রবীন্দ্রনাথ অন্যদিকে, কল্লোলীয়রা —এই বিপরীত পরিমণ্ডল নিয়ে যত গবেষণা

হয়েছে, সেই তুলনায় জগদীশ গুপ্তকে নিয়ে তেমনভাবে গবেষণার কাজ হয়নি। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচিত এখনো পর্যন্ত তিন-চারটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থ পাওয়া যায়। এইসব আলোচনা গ্রন্থ পাঠ করার পরেও মনে হয়েছে জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য ও আঙ্গিকের অভিনবত্ব নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হওয়া দরকার—যাতে সমকালে প্রায় অবহেলিত লেখককে বর্তমানের নগদমূল্য দেওয়া যায়। সেজন্যই আমার গবেষণাকর্মের অবতারণা।

'জগদীশ গুপ্তের উপন্যাস : স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান' এই শিরোনামে আমার আলোচনাকে আটটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। বিষয় ও আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর মূল্যায়ন করার প্রয়াস করেছি। পর্যায়ক্রমে বিষয়গুলি হল—

প্রথম অধ্যায়	:	বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্ব : জগদীশ গুপ্তের পূর্বসূরীদের উপন্যাসের জগৎ।
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	জগদীশ গুপ্তের জীবন অভিজ্ঞতা : তাঁর উপন্যাসের ভিত্তি ভূমি।
তৃতীয় অধ্যায়	:	উপন্যাসে বর্ণিত সমাজ ধারায় প্রতিকূল স্রোত।
চতুর্থ অধ্যায়	:	সামাজিক নারী-পুরুষের সম্পর্ক : নতুন দিকের সন্ধান।
পঞ্চম অধ্যায়	:	অন্ধকার গলিপথের মানুষ : নিয়তির হাতের পুতুল।
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	চরিত্রদের মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল গতি।
সপ্তম অধ্যায়	:	উপন্যাসের আঙ্গিক ও ভাষা : একটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষা।
অষ্টম অধ্যায়	:	ঔপন্যাসিক হিসেবে মূল্যায়ন।

প্রথম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের যে ধারা তাতে মানব জীবনের অন্ধকার গলিপথের যে নগ্ন বাস্তব দিক তা সচরাচর ধরা পড়েনি। সেই অনালোকিত জীবন ধারায় জগদীশ গুপ্ত কীভাবে আলো নিক্ষেপ করেছেন তাঁর উপন্যাসে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে রয়েছে লেখকের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতা। জন্মেছিলেন গ্রামীণ

পরিবেশে। জীবন পথ মসৃণ না হওয়ায় অল্পকালের মধ্যেই কর্ম জগতে প্রবেশ করেন। বিভিন্ন স্থানের আদালতে টাইপিস্টের চাকরীসূত্রে বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসার ব্যর্থ চেষ্টা আর চরম দারিদ্র্য সঙ্গী করে বেঁচে থাকা এবং তারই ফসল তাঁর রচনাগুলি।

তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে প্রচলিত সমাজ ভাবনার কথা কেমন করে স্বীকৃতি পায়নি বরং পল্লী সমাজের কুৎসিত দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে উপন্যাসে বর্ণিত কাহিনীতে।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে নারী-পুরুষের সম্পর্কের মেরুকরণ। 'নারীকে আপন ভাগ্য জয়' কিংবা 'নারীর মূল্য'কে নস্যাৎ করে নিতান্ত জৈবিক তাড়নায় নারী-পুরুষের জীবন কীভাবে অসুস্থ চেতনাকেই লালন করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে ঈশ্বরের প্রতি জিজ্ঞাসু, সত্য-শিব ও সুন্দরের প্রতি অবিশ্বাসী মানুষগুলি কেমন করে ক্রমশ জীবনের রাজপথ ছেড়ে অন্ধকার গতিপথ অতিক্রম করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে চরিত্রের 'আঁতের কথা'। মনোজগতের কুটিল বিসর্পিল গতি কীভাবে চরিত্রদের নিয়ে গেছে এক রহস্যময় জগতে সেকথা রয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে, জগদীশবাবুই প্রথম কীভাবে উপন্যাসের প্রচলিত ছক ভেঙ্গেছেন। তিনি প্লটকে গুরুত্ব দেননি, তাঁর বক্তব্যকে নিজের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছেন। সেইসঙ্গে ভাষার ক্ষেত্রেও এনেছেন অনেক অভিনবত্ব।

অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে 'অনুপস্থিত লেখক' জগদীশবাবুকে তাঁর কালের নিরীখে তুলনামূলক বিচার ক'রে তাঁর সৃষ্টি ধারার স্বাতন্ত্র্য অনুসন্ধান। সমকালে তিনি স্বীকৃতি পাননি, কিন্তু ভবিষ্যতের সচেতন পাঠক-গবেষকের দৃষ্টিতে তাঁর মৌলিকতা চিহ্নিত হয়েছে।